রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ, শিল্পীর দায়
অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়

একজন নামী শিল্পী যাঁর খ্যাতি রবীন্দ্রসংগীতের জগতের বাইরে অন্য কোথাও, রবীন্দ্রসংগীত গাইবার জন্য বা রেকর্ড করার জন্যে হঠাৎ এখন তিনি উৎসাহী কেন? বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে যাবার পর শিল্পীর স্বাধীনতায় ধরাকাট করার মতো কোন আইনসম্মত শক্তি নেই সম্ভবত এটাই প্রধান কারণ। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের বিরুদ্ধে একরাশ নালিশ ছিল - ডাকসাইটে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের হেনস্থা করা হয়েছে, বহু শিল্পীর গানের রেকর্ড অন্যায়ভাবে আটকে দেওয়া হয়েছে, রবীন্দ্রসংগীতকে বিশেষ প্রভাবশালী কিছু সম্প্রদায়ের কুক্ষিগতকরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। একথা বললে অত্যুক্তি হয় না, বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের সঙ্গে জনসমর্থন ছিল না। সেই সুযোগটা উল্লিখিত শিল্পীর দল নিচ্ছেন। রবীন্দ্রসংগীতের উপর বিধিনিষেধ নামক কোনো আপদ আর যখন নেই তখন ঠেকায়কে ! অতএব মাটির প্রতিমা গড়তে ডাকের সাজের মূর্তি বানাবো নাকি হিন্দি ছবির প্রিয় নায়িকার মুখের আদলে দুর্গা, কালী, লক্ষ্মীকে বিভূষিত করব, সে আমার ব্যাপার। ইচ্ছেমতো নিজের মালমশলা মিশিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের ঋদ্ধি ঘটাতে তাই উঠেপড়ে লাগা। এই সব শিল্পীদের রবীন্দ্রসংগীত জগতে প্রবেশের পিছনে অন্য কারণ, অহম-তাড়িত বহুমুখী প্রতিভা প্রদর্শনের দুরারোগ্য ব্যাধির বোধ। বুঝিয়ে বলি। যে শিল্পী সংগীতের অন্য বিশ্বেবেশ কিছু শ্রোতার মনো রঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছেন বলে বিশ্বাস করেন এবং তিনি যাই কিছু বলেন তাঁর ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দ তখন ‘‘কেয়াবত্’’ অথবা ‘‘কী শোনালো গুরু’’ ধবনিতে গানের আসর ভরিয়ে দিচ্ছেন, তখন শিল্পীর মনে এই আত্মবিশ্বাস জন্মানোয় দোষ কী--তাঁর ক্যাসেট, সিডি ভালই বিকোবে? সুতরাং আজ ভক্তি গীতি, কাল নজরুল গীতি, পরশু রাগপ্রধান, কোনদিন বা কাঁধে গীটার ঝুলিয়ে কিছু নতুন পরিবেশন এবং... এবং....এবং রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার প্রয়োজনবোধ তাঁর পক্ষে অন্তত মনস্তাত্তিক বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে অস্বাভাবিক নয়। সর্বোপরি এখনকার ছেলেমেয়েরা আমাদের সাহিত্য - সংগীতের মানচিত্রে রবীন্দ্রসংগীত আছে.এ কথাটা জানবে না তাইবা এই শিল্পীরা কেমনভাবে সহ্য করেন? অতএব এক মহান কর্মে ব্রতী হয়ে এই শিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীতের জগতে প্রবেশ করলেন। পরিবেশন করলেন নতুন ধারায় এক অদ্ভুত রবীন্দ্রসংগীত । নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই অদ্ভুত ধারায় গানের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলো। শিল্পীর আর এক প্রতিভার নিদর্শন পাওয়া গেল। ভক্তের দল আপ্লুত হল। শিল্পী বহুমুখী প্রতিভার প্রতিষ্ঠালাভে যারপরনাই আদিত হলেন। সব পুজোর আগে যেমন গণেশ পূজো, শিল্পীও এবার থেকে সেই ধারা মাথায় রেখে তাঁর অনুষ্ঠানে একটা আধটা রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে আসর শুরু করতে লাগলেন। আসল পুজোর হোমানলে যেমন গণেশ ঢাকা পড়েন, রবীন্দ্রসংগীতের দশাও শেষে তাই।

মতামতের ব্যাপারে নিজেদের উদার প্রতিপন্ন করার জন্যে রবীন্দ্রসংগীতকে মাঠে, ঘাটে, পানশালায় ছড়িয়ে দিতে যাঁদের আপত্তি নেই তাঁরা এই পর্যন্ত পড়েই হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা ভাবতে পারেন, শ্রোতা নিচ্ছে শিল্পী গাইছে এনিয়ে বাড়তি কথার কী প্রয়োজন? তাঁদের কাছে আবেদন - আইনের জোরে আর আটকাবার পথ নেই, সুতরাং যে যেমন চান তেমন রবীন্দ্রসংগীত গাইতেই পারেন। কিন্তু যথার্থ রাবীন্দ্রিক গায়নভঙ্গীর রবীন্দ্রসংগীত বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারেকেউ যদি একটা সুস্থ প্রচেষ্টার

কথা ভাবেন তাতেও তো ক্ষতি নেই। তাই কেউ কেউ মনে করতে পারেন তাঁদের উপর একটা গুরু ভার এসে পড়েছে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রসংগীতের পুরনো ধাঁচ এবং গায়কী সম্বন্ধে জানুক, রবীন্দ্রনাথের সংগীতভাবনা ঠিক কীরকম ছিল পরখ করা, তার পর ভাল না লাগে বাতিল করলো। শতকরা দু-চার -পাঁচভাগ ছেলেমেয়ে গ্রহণ করলেও এই ব্যক্তিদের একটা তুষ্টির জায়গা থাকবে - ঠুলি এঁটে ওদের চোখ আমরা বুজিয়ে রাখিনি।

রবীন্দ্রসংগীতের আসল উপভোগের বিষয় এক দার্শনিক অনুভূতির বোধ যা উচ্চাঙ্গের বাণী ও উপযুক্ত সমন্বয়ে গঠিত। যাঁদের কানে বৈচিত্র্যময় সিম্ফনী ছাড়া অন্য কিছুর প্রবেশ সহজ নয় অথবা চটুল ভাষায় বাঁধা গান শ্রবণে যাঁরা অভ্যস্ত, রবীন্দ্রসংগীত যে কোনো মুহূর্তে তাদের মন জয় করে নিতে পারবে এমনটা আশা করা উচিত নয়। তাদের বোঝাতে হবে রবীন্দ্রনাথের ভাষা, রবীন্দ্রনাথের সংগীতভাবনা। ''কথা ও সুর'' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য --''আমরা যে গানের আদর্শ মনে রেখেছি তাতে কথা ও সুরের সাহচর্যই শ্রদ্ধেয়, কোনো পক্ষেরই আনুগত্য বৈধ নয়। সেখানে সুর যেমন বাক্যকে মানে, তেমনি বাক্যও সুরকে অতিক্রম করে না। কেননা অতিত্র মণের দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির সামঞ্জস্য নষ্ট করা কলারীতি বিরুদ্ধ। যে বিশেষ শ্রেণীর সংগীতের বাক্য ও সুর দুইয়ে মিলে রসসৃষ্টির ভার নিয়েছে সেখানে আপন গৌরব রক্ষা করেও উভয়ের পদক্ষেপ উভয়ের গতি বাঁচিয়ে চলতে বাধ্য'' রবীন্দ্রনাথের নিজের এই মন্তব্য যাঁর মনে কিছুমাত্র রেখাপাত করবে তিনি প্রথমেই বুঝে ফেলবেন এই গান শোনার জন্যে একটা সুস্থ পরিবেশ প্রয়োজন। পাঁচমেশালী গানের অনুষ্ঠান হরেক রকমের বাদ্যি আর ভেঁপুর মেলায় একে টেনে নিয়ে এলে এর রসগ্রহণ সুবিধের নাও হতে পারে। এ কথা ঠিক, সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক থাকলে এ গানের মর্মবাণী হৃদয়ে সহজে প্রবেশ করে। । তাই বলে অভিজ্ঞতালব্ধ দর্শনবোধে এ গানের ভাষা উপভোগ করা যায় না এমন নয়। প্রয়োজন সামান্য মানসিক প্রস্তুতি। তার জোরেই শ্রোতা এ গানের কথা আর সুরের অপূর্ব সমন্বয়ে স্বাদ পাবে। এখন কথা শ্রোতাকে তৈরি করবে কে ? অবশ্যই শিল্পী। সেই শিল্পী যিনি নিজে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। রবীন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত উক্তির মর্মকথা যিনি স্বয়ং অনুধারন করেছেন। শিল্পীকে মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতে তাঁর অনুমতি ব্যাতিরেখে রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড প্রকাশ করা যেত না। দিলীপ কুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর প্রাসঙ্গিক চিঠিগুলি নিজের গান সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনা এবং স্পর্শকাতরতার সাক্ষ্য বহন করে। দিলীপ কুমার রায় বাণীর গুরুত্ব বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথের গানকে আরও সুন্দর সুরে গাইতে পারেন জানালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যোগ্যতা মেনেনিয়েও তাঁকে সেই স্বাধীনতা দিতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের ভয় ছিল, এই স্বাধীনতা ঢালাও ছেড়ে দিলে অযোগ্য হাতে বাণী ও সুরের সুসমন্বয়ে ব্যখাত ঘটবে। সুতরাং যে শিল্পী রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করবেন নিজের রং আর মালমশলা মিশেল করার আগে তাঁকে মনে রাখতে হবে তিনি একটা স্পর্শকাতর বিষয়ে হাত দিয়েছেন। এর একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতরতার স্মৃতির উপস্থিতি, অন্যদিকে যথার্থ রবীন্দ্রিক রবীন্দ্রসংগীত শুনতে অভ্যস্ত শ্রোতৃকুলেরও স্পর্শকাতর কান।

যথার্থ রবীন্দ্রংগীত বলতে তেমন গায়নরীতি যেখানে সুর বাণীকে ছাপিয়ে যায়নি অথবা বাণী সুরকে পিছনে ফেলে মূলতঃ আবৃত্তি ধর্মী হয়ে ওঠেনি। এর মানে এই নয়, রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী কোনোদিনই কোনো স্বাধীনতা যোগ করেননি বা শিল্পীরব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রসংগীতের বিধিনিষেধে বরাবরই চাপা পড়েছে।

কণ্ঠস্বরের স্বকীয়তা ছাড়াও বহু শিল্পীকে দেখা গেছে স্বরলিপির বাইরে গুঁড়ো কাজ আরোপ করতে, স্পর্শস্বর প্রয়োগ বা বর্জন করতে, মীড়ের প্রতি বাড়তি ঝোঁক দেখতে ইত্যাদি ইত্যাদি। তেমনি আবার বাণীর ভাব প্রকাশের জন্যে কোনো কোনো শব্দে জোর দেওয়া, কোন কোনো শব্দ নরম ক'রে উচ্চারণ করা শিল্পী বিশেষ ভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে যোগ্য শিল্পীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত তাতে বেমানান শোনায়নি কারণ শিল্পী সেক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করতে চেয়েছেন একটা সীমারেখা লঙ্ঘন না করে এবং স্বাধীনতা ভোগ করতে যন্ত্রণা না হেনে । অর্থাৎ শিল্পী স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারী হতে চাননি। আজকের প্রজন্ম রবীন্দ্রসংগীতের গোড়ার কথা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী প্রজন্মের শ্রোতাদের তুলনায় সাধারণ ভাবে কম আগ্রহী এই কঠোর বাস্তবটুকু মাথায় রাখলে এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবধারায় স্বয়ং অনুপ্রাণিত হলে আজকে শিল্পীর কতগুলো বাড়তি দায় না নিয়ে উপায় নেই। যাঁর জিনিস তিনি নেই, শিল্পীর স্বাধীনতা খর্ব করারমতো শক্তি নেই, সুতরাং স্বৈরাচারের পথে হাঁটলে আমায় ঠেকায় কে, সংগীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট এই ধরনের মনোভাবও নিন্দনীয় । ইদানীংকালে যেসব শিল্পী রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের নামে বিচিত্র পথে হাঁটছেন তাঁদের মনে রাখতে হবে বাণী ও সুরকে তাঁর গানে যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপ্যারে রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতার খামতি ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ রাগরাগিনীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সচেতনভাবে তিনি ব্যাকরণের স্খলন ঘটিয়েছেন বাণীর খাতিরে। আবার বাণীকেও সুরের খাতিরে মানানসই করে তুলেছেন। ''আমাদের সংগীত'' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, ''...আমার বিশ্বাস হয় বাংলাদেশে কাব্যের সহযোগে সংগীতের যে বিকাশ হচ্ছে, সে একটা অপরূপ জিনিস হয়ে উঠবে। তাতে রাগরাগিনীর প্রথাগত বিশুদ্ধতা থাকবে না ; যেমন কীর্তনে তা নেই ; অর্থাৎ গানের জাত রক্ষা হবে না, নিয়মের স্খলন হতে থাকবে, কেননা তাকে বাণীর দাবি মেনে চলতে হবে । কিন্তু এমনতর পরিণনয়ে পরস্পরের মন জোগাবার জন্যে উভয় পক্ষেরই নিজের জিদ কিছু কিছু না ছাড়লে মিলন সুন্দর হয় না। এই জন্য গানে বাণীকেও সুরের খাতিরে কিছু আপস করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়। '' সতর্ক শিল্পীর বোঝা উচিত অনেক ভাবনা - চিন্তা করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে একটা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাঁর গানের মান অতি উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে।'' খোদার উপর খোদকারি প্রচেষ্টা বিপর্যয় ডেকে আনলে সেটা আদৌ সুখের হবে না।

রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে বসলে মূলতঃ দুটো জিনিসের উপর চোখ পড়ে। এক, শ্রোতার চিত্র তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা এবং দুই, যথার্থ রবীন্দ্রসংগীতকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। যেমন তেমন গান শ্রোতা নিলেও শ্রোতার এক ধরনের চিত্র তৈরী হয়েছে স্বীকার করতে হয়। সেক্ষেত্রে চির প্রকৃতি শিল্পীভেদে এক এক ভক্ত সম্প্রদায়ের কাছে এক একভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র সংগীত তখন অমুকের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত, তমুকের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত, হিসাবে পরিচিত হয়। রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি চাইবেন একটা পরিবর্ত ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা যাতে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশিত হরে সর্বজনস্বীকৃত সর্বজনগ্রাহ্যগানের রীতিতে যার লক্ষ্য হবে রবীন্দ্রসংগীতের মূল আবেদনকে অক্ষত রাখা, তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সংগীতবিষয়ক ভাবধারাকে বাঁচিয়ে রাখা। এক কথায় রবীন্দ্রসংগীতকে রবীন্দ্রিক রাখা। শ্রোতার চিত্র তৈরীর অর্থ এমন রবীন্দ্রসংগীতে শ্রোতার কানকে অভ্যস্ত করে তোলা। শিল্পীর সেই দায় বহন করা সামর্থ্য থাকলে তবেই তিনি প্রকৃত শিল্পী।

যথার্থ রবীন্দ্রংগীতকে বাঁচিয়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজন এমন একটা সংস্থা গঠন করা যার কাজ হবে শিল্পীদের স্বীকৃতি প্রদান। এই স্বীকৃতি অবশ্যই আইনের চোখে বাধ্যতামুলক হতে পারে না। কিন্তু কল্পিত সংস্থা যদি স্বনামধন্য সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সংগীতশিল্পী বিশিষ্ট অধ্যাপক, চলচ্চিত্র ও নাট্য জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গর দ্বারা গঠিত হয় যাঁদের যোগ্যতা সম্বন্ধেকার মনে কোনো সংশয় থাকবে না তবে সেই সংস্থার স্বীকৃতি যথেষ্ট সম্মানজনক এক সনদ রূপে পরিগণিত হতে পারে। শিল্পীরাও সেই স্বীকৃতির জন্যে ব্যগ্র হতে পারেন। এই সংস্থার লক্ষ্য হবে যথার্থ গায়নভঙ্গীতে পরিবেশিত রাবীন্দ্রিক রবীন্দ্রসংগীতকে বাঁচিয়ে রাখা। সংস্থা লক্ষ্যপথে দৃঢ় পদক্ষেপে চললে এমন দিন আসা সম্ভব যেখন শিল্পীর গানের সিডি বা ক্যাসেটে, সংস্থার স্বীকৃতির কথা ঘোষিত হলে শিল্পীর পক্ষে তা গর্বের বিষয় হবে, বিশেষ এক কৌলীন্যের পরিচায়ক হবে। সিডি বা ক্যাসেটের সম্ভাব্যত্রে তা ঘোষিত স্বীকৃতির ছাপ দেখে সিডি বা ক্যাসেটের মান সম্বন্ধে আস্থা অর্জন করবেন তারপর অর্থব্যয় করতে রাজী হবেন। শিল্পীদের মধ্যে যথার্থভাবে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের মানসিকতা জন্ম নেবে। সুস্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রাবীন্দ্রিক রবীন্দ্রসংগীত দীর্ঘজীবি হবে । সেটাই কাম্য।